আজকের কাগজ

18 JAN 1995

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আমাদের শিক্ষা কাঠামো একটি প্রস্তাব

বদরুদ্দীন আহমদ চৌধুরী

এ লেখায় আমি কোনো জটিল তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে আগ্রহী নই। নিরেট বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমার আলোচনার মূল লক্ষ্যবিন্দু দু'টিঃ প্রথমতঃ বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা এবং দ্বিতীয়তঃ দেশের নীতি-নির্ধারক, প্রকল্পক, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সামনে শিক্ষা-কাঠামো সংক্রান্ত একটি বস্তুনিষ্ঠ প্রয়োগ-সম্ভব এবং সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনের প্রস্তাব উপস্থাপন করা। এ জাতীয় আলোচনা হয়তো আমাদের শিক্ষা সমস্যার মুখ্য দিকগুলো চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরো ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা-বিচার-বিবেচনার দ্বার উন্মুক্ত করবে। এবং এরই ভেতর দিয়ে হয়তো আমরা দ্রুত একটি সঠিক ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবো।

আমাদের দেশে বর্তমানে একজন শিক্ষার্থী যখন বিশ্ববিদ্যালয় স্তর অতিক্রম করে আসে, তখন তার বয়স হয় অন্যূন ২৬/২৭ বছর। এখন যে অবস্থা চলছে তার উন্নতি করা হলেও ২৩ বছর বয়সের আগে কেউ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে বলে মনে হয় না। যাই হোক ২৬/২৭ বছর বয়সে এ রকম একজন শিক্ষার্থী যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সম্পূর্ণ করলো তখন যদি তাকে প্রশ্ন করা হয়ঃ আপনি তো জীবনের এতোগুলো বছর লেখাপড়া করলেন, বলুন এখন আপনি দেশের জন্য কিংবা নিজের জীবিকার জন্য কি ধরনের কাজের যোগ্যতা অর্জন করেছেন? তরুণ শিক্ষার্থী এই প্রশ্নের তেমন কোনো সদুত্তর দিতে পারবেন না। আমি নিজে বহু তরুণ-তরুণীর কাছে এ প্রশ্ন রেখেছি, কিন্তু তারা কেউই এর নির্দিষ্ট বা সুস্পষ্ট কোনো জবাব দিতে পারেনি। অবশ্য সাধারণতঃ এদের সকলেই কলা অথবা বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছে। প্রযুক্তিবিদ্যা ও কৃৎকৌশল বিষয়ে যারা পড়াশোনা করেছেন, আমার ঐ প্রশ্নের উত্তরে তারা কী বলতেন তা অবশ্য আমি অনুমান করতে পারি। যাই হোক, যারা আমার ঐ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন তারা হয়তো বলতে পারতেন যে শিক্ষা শেষে তারা সব ধরনের কাজেরই যোগ্যতা অর্জন করেছেন। কিন্তু তাদের জ্ঞান পরীক্ষা করার পর এই বক্তব্যটুকু আপনি মেনে নিতে পারবেন কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এর ব্যতিক্রম অবশ্য কিছু কিছু আছে, তবে তা এতো নগণ্য যে, সেটা উপেক্ষা করলেও আমার মন্তব্যের যথার্থতা ক্ষুণ্ন হবে না।

এখন আমার প্রশ্ন, এই যে ২৬/২৭ বছর বয়স্ক হাজার হাজার যুবক-যুবতী প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে বেরিয়ে আসছে, তারা দেশের কি কাজে লাগবে? তাদের শিক্ষা অর্জনের পেছনে যে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করা হলো, রাষ্ট্র তা থেকে কি আদৌ উপকৃত হবে? অপ্রিয় অথচ অনস্বীকার্য সত্য এই যে, এদের শিক্ষার মান মোটেই সন্তোষজনক নয়। এর পেছনে ক্রিয়াশীল কারণ অনেক। সে প্রসঙ্গে না গিয়েও বলা যায় এই সদ্য উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ সম্প্রদায় একমাত্র যে পেশাটির জন্য উপযুক্ত, তা হচ্ছে চাকরি। সোজা কথায় কলম-পেশা। কিন্তু প্রতি বছর যে বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণী শিক্ষাগ্রহণ সম্পন্ন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসছে তাদের সবার জন্য কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেওয়া কি সম্ভব? আর প্রত্যেককে একটি করে চাকরি দিতে পারলেই কি দেশের উন্নতি হয়ে যাবে? এদেরকে উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে নিয়োজিত করতে না পারলে তো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হবে না, অথচ দেশের সার্বিক উন্নয়নের সেটাই হচ্ছে মূল চাবিকাঠি।

বাস্তব অবস্থাটা তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ শিক্ষাঙ্গনের চার দেয়ালের মধ্যে ব্যয় করে একটি যুবক বা যুবতী বাইরে বেরিয়ে এসে নিজেকে আবিষ্কার করছে এক চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে। তার অর্জিত জ্ঞান বা শিক্ষা কোনোটাই প্রয়োগের যথার্থ ক্ষেত্র সে খুঁজে পাচ্ছে না। বেকারত্ব প্রলম্বিত হওয়ার সাথে সাথে সে উপলব্ধি করতে পারছে যে, এই সমাজে হয়তো সে একান্তই অপ্রয়োজনীয়। এমন কি সমাজের বোঝাস্বরূপ। এই অবস্থা থেকেই যুব-সমাজের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে হতাশা এবং নৈরাজ্য। গোটা দেশটাকে তার মাশুল দিতে হচ্ছে। এই নব্য উচ্চশিক্ষিত যুব-সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজনই মাত্র তাদের উপযুক্ত অবস্থান লাভের সুযোগ পাচ্ছে। এটুকু আমাদের আশান্বিত করতে পারে না। এখন, এই যে দেশের এক বিরাট শক্তি এভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা যাবে- এই শক্তিকে বাঁচিয়ে কি দেশের উন্নতিকল্পে ব্যবহার করা যায় না? অবশ্য যায়। কিন্তু কিভাবে? আমার মতে এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে।

বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যবচ্ছেদ করলেই [illegible]র মধ্যে আমরা খুঁজে পাবো অতীতের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক [illegible]গের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকট ছায়া। এই উক্তি হয়তো তর্ক-[illegible]তর্কের সূত্রপাত করবে। কিন্তু আমি জোর দিয়ে বলতে [illegible]ই যে এ দেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হবার পর থেকে [illegible]জ পর্যন্ত শৃংখলমুক্ত স্বাধীন জাতির উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা [illegible] করার নামে অনেক বড়ো বড়ো কথা বলা হয়েছে, [illegible]ক্ষেপ নেয়া হয়েছে, কিন্তু কার্যত এই [illegible] [illegible]টা পরিবর্তন হয়নি। মূল কাঠামো এখনও সেই [illegible]তোই আছে। পরিবর্তন যা রয়েছে [illegible] [illegible]রই কিছুটা অদল-বদল মাত্র। [illegible]

ঔপনিবেশিক শক্তি নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হিসেবেই এ দেশের জন্য তার সুচতুর শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছিলো এবং তারই ভিত্তিতে একটি বলিষ্ঠ শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক কাঠামো অপরিবর্তিত থেকে যাওয়ার বিষয় ফলস্বরূপই আমাদের আজকের এই সংকট। এই কথাটি সংশ্লিষ্ট সকলকে গোড়াতেই অনুধাবন করতে হবে।

বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সঠিক পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী বিশ্লেষণ করার পর আমাদের নীতি ও দিগদর্শন নির্ধারণ করতে হবে। এবং তারই ভিত্তিতে করতে হবে শিক্ষা কাঠামোর পুনর্বিন্যাস। শিক্ষাপ্রণালী বা পদ্ধতিকে ঐ কাঠামোর উপযোগী করে তুলতে হবে।

এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা কি আমরা উদ্ভাবন করতে পারি না যাতে একজন শিক্ষার্থী একটা নির্দিষ্ট স্তরে শিক্ষা শেষ করে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ভাবতে পারে, বলতে পারেঃ আমি এই কাজটির উপযুক্ত। এই কাজটি আমি সুষ্ঠুভাবে করতে পারবো। আমি আমার নিজের জীবিকা এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এই কাজটা সফলভাবে চালিয়ে যেতে পারবো। শিক্ষা প্রণালীর মাধ্যমে আমরা কি একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে এই মনোবল, শিক্ষা, যোগ্যতা ও শক্তি সঞ্চারিত করতে পারি না? এগুলো যার মধ্যে থাকবে সে অবশ্যই তার নিজের জন্য একটা কাজ বেছে নিতে আত্মপ্রণোদিত হবে। এই উৎপাদনমুখী কাজ শুধু যে তরুণটির জীবনই সমৃদ্ধ করবে তাই নয়, দেশ ও দশের সামগ্রিক উন্নয়নের সহায়ক হবে।

এ সব প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণ ও নিয়মবদ্ধ চিন্তাভাবনার ভিত্তিতে আমি আমাদের শিক্ষা কাঠামো কি ধরনের হওয়া উচিত- তার একটা প্রাথমিক ছক প্রণয়ন করেছি। এটি সর্বাংশে নির্ভুল এবং লক্ষ্যভেদী বলে বিবেচিত নাও হতে পারে। দেশের চিন্তাবিদ, বিশেষজ্ঞ ও জ্ঞানী-গুণী যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা এটির সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং এমন কি প্রয়োজন হলে এর সঙ্গে নতুন কিছু সংযোজন করার মাধ্যমে এটিকে হয়তো সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেন।

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি বিবেচনায় রেখে আমি এ দেশের শিক্ষা-কাঠামো সংক্রান্ত যে ছকটি এঁকেছি তা এই রকমঃ

দেশের সকল নাগরিককে একটা বিশেষ স্তর পর্যন্ত শিক্ষাদানের দায়িত্ব থাকবে একান্তই সরকারের। এই স্তরে শিক্ষা দেওয়ার মূল লক্ষ্য হলো একজন শিক্ষার্থীকে ততোটুকু শিক্ষিত করে তোলা, যাতে সে বাংলা ভাষায় লিখতে ও পড়তে পারে এবং তার দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশ রাখতে পারে। সেই সঙ্গে তাকে দিতে হবে আধুনিক বিশ্বের সাথে সংগতি রেখে কিছুটা সাধারণ জ্ঞান, প্রাথমিকস্বাস্থ্য-বিধি শিক্ষা এবং ধর্মীয় শিক্ষা। এ স্তর পর্যন্ত শিক্ষাদানের জন্য ৪ বছর সময় দেওয়া যেতে পারে। এবং একেই অভিহিত করা হবে প্রাথমিক স্কুল শিক্ষারূপে। এ স্তরে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন শুরু হবে পাঁচ বছর বয়স থেকে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের স্কুল শিক্ষা হবে ছয় বছর মেয়াদী। পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হবে বাংলা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান এবং টেকনিক্যাল অর্থাৎ প্রয়োগিক বিষয়সমূহ। এ স্তরে বাংলা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষাজ্ঞান ততোটুকু উন্নত করা, যাতে তারা বাংলা ভাষায় রচিত সাধারণ বইপত্র, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি পড়ে বুঝতে পারে। সাধারণ বিষয়াদি সম্পর্কে বাংলায় শুদ্ধভাবে লিখতে পারে। গণিতের পাঠ থাকবে অংক শাস্ত্রের সাধারণ নিয়মাবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইতিহাস এবং ভূগোলের পাঠ থাকবে স্থানীয় থেকে জাতীয় অর্থাৎ দেশ পর্যায় অবধি বিস্তৃত। সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠে থাকবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সাধারণ জ্ঞান যা তার দৈনিক জীবনযাপনে সহায়ক হবে। সেই সংগে বিজ্ঞান শিক্ষা বা চর্চার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষার্থী যাতে সম্যক উপলব্ধি করতে পারে, সে রকমভাবে শিক্ষাদানের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। টেকনিক্যাল, অর্থাৎ প্রয়োগিক বা ব্যবহারিক বিষয়াদি হবে ব্যাপক। এর মধ্যে থাকবে বিভিন্ন ফসল, তরিতরকারী ও ফলফুলের চাষ পদ্ধতি, গরু-মোষ ইত্যাদি পালন, মোরগ হাঁস-পালন, মাছ চাষ, গুটি পোকা ও মৌমাছির চাষ, কাঠের কাজ, রাজমিস্ত্রীর কাজ, প্লাম্বারের

প্লাম্বারের কাজ-[illegible] ধাত[illegible]নল সংস্থাপন ও মেরামতের [illegible]